আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের *সংস্কৃতির ভাঙা সেতু* : সাহিত্যের স্বরূপ অন্বেষণ

সুলতানা নাজনীন*

[**সারসংক্ষেপ :** আখতারুজ্জামান ইলিয়াস তাঁর প্রবন্ধে শাণিত ও যুক্তিপূর্ণ গদ্য নির্মাণে জীবনের গভীর উপলব্ধির প্রকাশ করেছেন। তাঁর *সংস্কৃতির ভাঙা সেতু* (১৯৯৭) প্রবন্ধগ্রন্থের ২২টি প্রবন্ধের অধিকাংশ জুড়ে রয়েছে সাহিত্যিক, গ্রন্থ এবং সাহিত্য সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে লেখকের নিজস্ব দৃষ্টিকোণের প্রক্ষেপ। প্রাবন্ধিক গ্রন্থ বা গ্রন্থাকারের সৃষ্টিশীলতা নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি আমাদের সাহিত্য, সাহিত্য সমালোচনার বর্তমান সংকট, ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা প্রভৃতির বিচারে বিশ্লেষণপ্রবণ সমালোচক মানসের পরিচয় দিয়েছেন। সাহিত্য বিষয়ক তাঁর এই সব সমালোচনা আবর্তিত হয়েছে বাংলা কথাসাহিত্য, কথাসাহিত্যিক, সংগীত, সংগীত-শিল্পী ও বাংলা চলচ্চিত্রকে কেন্দ্র করে। বর্তমান প্রবন্ধের স্বল্পায়তন পরিসর সাহিত্য বিষয়ে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের এই বিচিত্রতর স্বাতন্ত্র্য অনুসন্ধানের একটি প্রয়াস মাত্র।]

সংকেত শব্দ : কথাসাহিত্য, জীবনবাদী চেতনা, সমাজবাদী দৃষ্টি, সাহিত্যের স্বরূপ।

ষাটের দশকে বাংলা সাহিত্য-অঙ্গনে যে-সব প্রতিভাধর শিল্পী আবির্ভূত হয়েছেন, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (১৯৪৩-১৯৯৭) তাঁদের অন্যতম। মূলত গল্প ও উপন্যাসের ভুবনই তাঁর স্বচ্ছন্দ চর্চার ক্ষেত্র। কিন্তু গল্প, উপন্যাসের আধারে যখন এই সমাজ, সমাজের মানুষ, মানুষের ভাবনাকে আর প্রতীকায়িত করা যাচ্ছিল না, তখনই লিখলেন প্রবন্ধ। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস যে তাড়নাতে গল্প-উপন্যাস লিখেছিলেন সে তাড়নাতেই লিখলেন প্রবন্ধ। কেননা একজন সচেতন লেখক হিসেবে গল্পকার-ঔপন্যাসিক আখতারুজ্জামান ইলিয়াসকে ঢুকতে হয় বাংলা গল্প-উপন্যাসের ভেতরে, যেখানে সঞ্চিত সকল উক্তি-উপলব্ধি ঝেড়ে-বেছে উপস্থিত করতে হয় স্বনির্বাচিত এক সংকলন। এ প্রসঙ্গে শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন :

> যে তাড়নাতেই 'তারাবিবির মরদ পোলা' বা 'চিলেকোঠার সেপাই' 'খোয়াবনামা' লেখেন সে তাড়নাতেই গল্প-উপন্যাস নিয়ে প্রবন্ধ লেখেন তিনি। ইলিয়াসের সাহিত্যচিন্তার সূত্রে ইলিয়াসের সাহিত্য পড়ায় হয়তো বিপাক আছে, কিন্তু এটুকু অন্তত জোর দিয়ে বলা যায়, তাঁর কথাসাহিত্য ও প্রবন্ধের পেছনে রয়েছে অভিন্ন রাজনৈতিক অভিনিবেশ। (আখতারুজ্জামান, ১৯৯৮ : ভূমিকা)

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের প্রবন্ধের ভান্ডার তখনই সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে, যখন আমাদের সাহিত্যের সংকট, সংকটের উত্তরণ তাঁকে ভীষণভাবে নাড়া দেয়। সাহিত্যের সীমাবদ্ধতা, রাজনৈতিক অস্থিরতা ও পচন প্রভৃতি তাঁর প্রবন্ধের শরীরে নিজস্ব কথকথার ভঙ্গিতে বিশ্লেষিত হয়েছে। অনুপম জীবনবেদ ও গভীরতর চিন্তার বহুমাত্রিক প্রকাশ তাঁর প্রবন্ধগুচ্ছ। প্রাবন্ধিক হিসেবে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের দৃষ্টিভঙ্গি কখনোই একটি বিষয়ে স্থির থাকেনি। সাহিত্য থেকে দর্শন, সমাজ থেকে রাজনীতি, সংগীত থেকে চলচ্চিত্র, বস্তু থেকে ব্যক্তি সর্বক্ষেত্রে তাঁর চিন্তার মৌলিকতা ধারণ করেছে প্রবন্ধসমূহ। তবে সাহিত্য প্রচেষ্টায় বিষয়ের বৈচিত্র্যের সাথে

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়।

মূলকথা হলো দৃষ্টিভঙ্গির স্বাতন্ত্র্য। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের প্রবন্ধে তাঁর বক্তব্যের বহুমাত্রিকতা ও প্রাবন্ধিক দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিকতা বিদ্যমান।

সমাজের সামাজিক সংকট ও সমস্যার সমাধান যে সামাজিক অবস্থানের আলোতে বন্দি সে বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে সুশান্ত মজুমদার এ সংকট হতে উৎসারণে বাংলা সাহিত্যে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের অবস্থান নির্ণয় করেছেন এভাবে—

> অন্তর্গত ও বহির্মুখী সমূহ সমস্যা প্রোথিত রয়েছে নির্দিষ্ট পরিপ্রেক্ষিত ও শ্রেণী অবস্থানে। সমাজের শরীরে শরীরে খুঁজতে হয় মানুষের অবস্থান ও উত্থান। যে সমাজে মানুষের জীবনযাপন, তাঁর বাঁচা-মরা, নির্মাণ ও বিনাশ, এমনকি তাঁর সংস্কৃতি, রাজনীতি ও শিল্প, সংস্কৃতি, রাজনীতি ও শিল্প-সাহিত্য; এই বাস্তবতা নিয়ে বাংলা সাহিত্যের স্বতন্ত্র ও শক্তিমান লেখক আখতারুজ্জামান ইলিয়াস। (সুশান্ত, ১৯৯৭ : ৩১)

সেই প্রেক্ষিতে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস প্রবন্ধের বিষয়কে নির্মোহ-নৈমিত্তিক-নিরাবেগ দৃষ্টিতে উপস্থাপন করেছেন। *সংস্কৃতির ভাঙা সেতু* প্রবন্ধগ্রন্থের অধিকাংশ রচনাই সমালোচনার নান্দনিক বৈশিষ্ট্যের সাথে সামাজিক উপযোগিতার বিশ্লেষণে প্রাবন্ধিকের মনোযোগ লক্ষণীয়। পাশাপাশি আমাদের সাহিত্যের সংকট ও সম্ভাবনা প্রভৃতির বিচারেও তাঁর বিশ্লেষণপ্রবণ মনের পরিচয় লক্ষযোগ্য। আধুনিক সাহিত্য-শিল্প পরিগ্রহণে এবং বর্তমানতার সম্প্রসারণে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের চেতনায় যে শিল্পবোধ গড়ে উঠেছে তারই আলোকে সংগঠিত তাঁর সমালোচক-মানস। বাংলাদেশের সাহিত্যের উৎকর্ষ ও পরিচর্যায় *সংস্কৃতির ভাঙা সেতু* প্রবন্ধগ্রন্থের ভূমিকা তাই অপরিসীম।

সাহিত্যজীবনের শেষপর্বে প্রকাশিত হয়েছে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের প্রবন্ধগ্রন্থ *সংস্কৃতির ভাঙা সেতু* (১৯৯৭)। প্রবন্ধগ্রন্থটিতে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার সমস্যা, উপন্যাসে সমাজবাস্তবতা, লেখক ও সংস্কৃতিকর্মীর দায়িত্ব, বুলবুল চৌধুরীর প্রতিভা, কায়েস আহমেদ বা অভিজিৎ সেনের রচনা, রবীন্দ্র সংগীতের শক্তি, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পদৃষ্টি, ছোটগল্পের ভবিষ্যৎ, সূর্যদীঘল বাড়ি বা গান্ধী চলচ্চিত্র প্রভৃতি ব্যক্তি ও বিষয়ের আলোকপাত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ প্রবন্ধগ্রন্থের প্রবন্ধগুলো প্রথমেই নির্ভরযোগ্য কোন খসড়া রূপ লাভ করেনি। প্রবন্ধগুলো বিভিন্ন সেমিনারে, সভায়, আড্ডায় আলোচিত হয়েছিল মাত্র। পরবর্তীতে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের আগ্রহে ও উৎসাহে বর্তমান রূপ লাভ করে। এ সম্পর্কে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ভাষ্য :

> এই লেখাগুলো নানান আলোচনা সভায়, আড্ডায় এমনকি দু'একটি সেমিনারেও বলা হয়েছিল, পড়া বলতে যা বোঝায় তা হয়নি। কারণ এদের কোন নির্ভরযোগ্য খসড়া তখন ছিলনা। পরে বদরুদ্দীন উমরের চাপে আনু মুহাম্মদের তাগাদায় আর মাহবুবুল আলমের উস্কানিতে এগুলো চেহারা পায়। (আখতারুজ্জামান, ১৯৯৮ : কৃতজ্ঞতা অংশ)

এ প্রবন্ধসমূহ মূল্যায়ন করতে গিয়ে খালিকুজ্জামান ইলিয়াস বলেন—"প্রবন্ধ সংকলনের ২২টি রচনায় শিল্প ব্যক্তিত্ব, গ্রন্থ, ফিল্ম, সম্পাদকীয়, সাহিত্য ও সমাজ বিষয়ক প্রবন্ধগুলিতে তাঁর চিন্তার স্বচ্ছতা ও সামঞ্জস্য এবং বিশ্লেষণী শক্তির পরিচয় পাই" (আখতারুজ্জামান, ১৯৯৯ : ভূমিকা)।

বাংলাদেশের প্রবন্ধের একটা বিশাল অংশ জুড়ে বিস্তৃত রয়েছে সাহিত্য সম্পর্কিত আলোচনা। কিন্তু সাহিত্য-সমালোচনা সম্পর্কে তেমন সুনির্দিষ্ট কোনো যুক্তিপূর্ণ আলোচনা আমরা পাই না।

সাধারণ অর্থে কোনো সাহিত্যকর্মের ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, শ্রেণিকরণ, মূল্যায়ন ইত্যাদি সব বিষয়ই সাহিত্য সমালোচনার আওতাভুক্ত।

সংস্কৃতির ভাঙা সেতু প্রবন্ধগ্রন্থের অধিকাংশ প্রবন্ধই সাহিত্যিক ও সাহিত্য বিষয়ক। আশি ও নব্বইয়ের দশকে যখন বাংলা সমালোচনা সাহিত্য ছিল প্রায়ই কাব্যঘেঁষা তখন কথাসাহিত্য নিয়ে এমন চিন্তাশীল বিশ্লেষণ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। এখানে প্রাবন্ধিক জীবন, কথাসাহিত্য ও সাহিত্যিকের মধ্যে এক নিগূঢ় সম্পর্ক নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। সমালোচকের দৃষ্টিতে, "তাঁর সৃষ্ট কথাসাহিত্যের মতোই প্রবন্ধগুলোও তাঁর গভীর জীবনবোধ, বিষয়কে তাঁর সমগ্রতায় দেখার চোখ এবং শিল্পীর দায়বদ্ধতায় তাঁর বিশ্বাস তুলে ধরে" (আখতারুজ্জামান, ১৯৯৮ : ভূমিকা)। লেখকের মৌলিকতার উৎস এই দায়বদ্ধতা। বলা যায়, রচনাগুলো যেন সাহিত্যের নানা রকম বিষয়বস্তু ও সাহিত্যিকদের নানা চিন্তা-ভাবনা-দর্শন নিয়ে প্রাবন্ধিকের এক রকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

আধুনিক সাহিত্য-শিল্প পরিগ্রহণে এবং বর্তমানতার সম্প্রসারণে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের চেতনায় যে শিল্পবোধ গড়ে উঠেছিল তারই আলোকে সংগঠিত তাঁর সমালোচক-মানস। তিনি উল্লেখ করেন স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলা কথাসাহিত্য শৈলীগত মার্জিত ও পরিণত রূপ লাভ করেছে। কিন্তু বিষয় নির্জীব, নিষ্প্রাণ ও পুনরাবৃত্তময় হয়ে উঠেছে। কেননা একমাত্র সৃজনশীল লেখকের হাতে সাহিত্যের সৌন্দর্যময় ও উদ্দীপ্ত প্রকাশ সম্ভব। কিন্তু বর্তমান বাংলা কথাসাহিত্যে যা দুরূহ বিষয়। প্রাবন্ধিক বলেন—

> একথা ঠিক যে আমাদের কথাসাহিত্যে আঙ্গিক আগের চেয়ে মার্জিত ও পরিণত রূপ লাভ করেছে। সুখপাঠ্য গল্প-উপন্যাস অনেক লেখা হচ্ছে। কিন্তু বেশির ভাগ গল্প-উপন্যাস পড়ে মনে হয় যে একই ব্যক্তি বিভিন্ন নামে নানা কায়দায় একটিমাত্র কাহিনী বয়ান করছেন। (আখতারুজ্জামান, ১৯৯৮ : ২৭)

প্রতিবছর বিভিন্ন পালাপার্বণে ঢাকার রম্য পত্রিকাগুলোতে প্রকাশিত ডজন খানিক উপন্যাস পাঠককে সেঁটে রাখতে পারলেও প্রাবন্ধিকের কাছে সেগুলো শিল্পগুণ-বর্জিত পণ্য-স্বরূপ। কেননা—

> মানুষের প্রতিদিনকার জীবনযাপনে কোনো গভীর সত্য বা প্রশ্নের উন্মোচন সাম্প্রতিক কথাসাহিত্যে অনুপস্থিত। পাঠককে প্রচলিত মূল্যবোধ বা সমাজব্যবস্থা সম্বন্ধে কোনো জিজ্ঞাসার মুখোমুখি দাঁড় করাতে সাম্প্রতিক কথাসাহিত্য ব্যর্থ। (আখতারুজ্জামান, ১৯৯৮ : ২৭)

আধুনিক বাংলা কবিতায় আঙ্গিকগত পরিণতি আছে, আছে প্রতিবাদ ও সংকল্পের ভাষা। তাই সাম্প্রতিক সময়ে পাঠযোগ্য কবিতার সংখ্যা অনেক। কিন্তু কবিতাগুলো মানুষকে গভীরভাবে স্পর্শ করতে পারে না। কেননা সেগুলো জীবনের স্পন্দন ও প্রেরণা থেকে বঞ্চিত। তাঁর কারণ উল্লেখ করে প্রাবন্ধিক বলেন, বাংলা কাব্যজগতের কবিরা ভাষায় অলংকার ব্যবহার করে সাহিত্যচর্চার ক্ষুধা মেটান।

কথাসাহিত্যচর্চার সূত্রপাত হয় তখন যখন মানুষ ব্যক্তি হয়ে উঠে অর্থাৎ দশজনের মধ্যে একজন বলে চিহ্নিত হয়। কেননা কথাসাহিত্যিক তাঁর সাহিত্যে ব্যক্তির স্বরূপ সন্ধানে তৎপর হয়। সাহিত্যিক তাঁর সাহিত্যে সত্যটি জ্ঞাপন করার জন্যে তুলে ধরেন নানা ধরনের মানুষকে, ব্যক্তির ভেতরকার স্পন্দনটিকে। সাহিত্যিকের লক্ষ্য নির্ধারণ করে ইলিয়াস বলেন—"ব্যক্তির জীবন বলতে গেলে চলে আসে সমাজ। সমাজের বাস্তব চেহারা তাঁকে তুলে ধরতে হয় এবং শুধু স্থিরচিত্র নয়, তার ভেতরকার স্পন্দনটিই বুঝতে পারা কথাসাহিত্যিকের প্রধান লক্ষ্য"

(আখতারুজ্জামান, ১৯৯৮ : ৩৮)। কিন্তু তিনি দুঃখিত হয়েছেন যখন দেখেছেন বাংলা কথাসাহিত্যে উপন্যাসের যাত্রারম্ভ বহুপূর্বে হলেও উপন্যাসে সমাজজীবনের উপস্থিতি নাই। এ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসগুলো বিশ্লেষণ করে বলেন, বঙ্কিমচন্দ্র সফল উপন্যাস লিখলেও সমাজকে প্রায় ঠেলে ফেলতে উদ্যত হয়েছিলেন। কাহিনিকে চলমান সমাজজীবনের দলিলে পরিণত করার আকাঙ্ক্ষা বঙ্কিমচন্দ্রের হয়নি। সমাজ, সমাজের চলিষ্ণু চেহারা প্রভৃতি সমাজবাস্তববোধের অভাবে বঙ্কিমচন্দ্র সামাজিক সংগ্রাম ও কর্ম, দ্বন্দ্ব ও বিশ্বাসের ভেতর ব্যক্তির অস্তিত্বের ধারাবাহিকতাকে রক্ষা করতে পারেননি। তাই বঙ্কিমের উপন্যাসের যে সাংগঠনিক তীব্রতা, তা পাঠককে নাড়া দিলেও তেমন কোন তীক্ষ্ণতা এসব উপন্যাসে মেলে না।

সাহিত্যের সমাজলগ্নতা অর্থে সমাজ ও শিল্পের পাশাপাশি অবস্থান বা সমন্বয়ই একজন সাহিত্যিকের অন্বিষ্ট হওয়া উচিত বলে হাসান আজিজুল হকও মনে করেন। না হলে সেখানে শিল্পের মান বজায় থাকে না। এ প্রসঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন—

> সমাজবাস্তবকে নিরন্তর খুঁড়ে চলা এবং মানব অস্বিত্বের সবগুলি শর্তের হিসেব নেবার আপোষহীন সংকল্পগ্রহণ একজন সৎশিল্পীর জন্যে প্রায় বাধ্যতামূলক বলেই মনে হয়, কারণ খনন এবং বিশ্লেষণ সংশ্লেষণের ভিতর দিয়ে তিনি অন্ততপক্ষে তাঁর নিজ দেশের মানব-অস্তিত্বের বাস্তব তুলে ধরতে পারেন এবং বিকাশের সম্ভাবনাগুলোকে স্পষ্ট করে দেখাতে পারেন। (সুমন্ত, ১৩১৫ : ২১)

সমাজের গতিকে প্রথমদিকের বাংলা উপন্যাস অনুভব করতে না পারলেও বাংলা কথাসাহিত্যে ব্যক্তি ও সমাজের বিকাশের পথ প্রথম উন্মোচন করেন রবীন্দ্রনাথ। এ প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিকের উক্তি, "রবীন্দ্রনাথই জীবন ও মানুষ তৈরী করেন যাদের গড়ে ওঠা আছে, যাদের জীবনে বিকাশ আছে এবং যারা সমস্যায় পড়ার সঙ্গে সঙ্গে রেডিমেড সমাধান খুঁজে পায় না" (আখতারুজ্জামান, ১৯৯৮ : ৪৩)। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসে রয়েছে গ্রামের স্থিরচিত্র আর সমাজের ছড়ানো ছবি; যা কোলাহলময় কিন্তু স্পন্দনহীন ও গতিহীন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে যেন তার বিপরীতচিত্র। তারাশঙ্কর আঁকেন গ্রামের স্থিরচিত্র নয়, বরং উপস্থিত করেন রক্তমাংসের মানুষকে। অর্থাৎ সমাজের পরিবর্তন ও বিবর্তনের আওয়াজ শোনা যায় তাঁর উপন্যাসে। বাংলা কথাসাহিত্যে সমাজবাদী বিশ্লেষণ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে সবচেয়ে সফল হয়েছে। এ সম্পর্কে প্রাবন্ধিক বলেন, "মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এঁদের থেকে স্বতন্ত্র এই জন্য যে, সাহিত্যচর্চার শুরুতেই তিনি ব্যক্তির ক্ষয়কে একটি দুরারোগ্য রোগ বলে শনাক্ত করতে পেরেছিলেন। সমাজের অবক্ষয় ও ব্যক্তির অবক্ষয় কোনো বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়।" (আখতারুজ্জামান, ১৯৯৮: ৪৫)

সর্বোপরি গভীর সমাজচেতনা ও সন্দিগ্ধ দৃষ্টিজ্ঞান নিয়ে কথাসাহিত্যের গঠন সম্পর্কে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস বলেন, "উপন্যাস গঠিত হবে সেইভাবে যাতে করে নতুন ভাবনাকে ঠিকমতো ধারণ করা যায়। নইলে এই সময়ের মানুষের বেদনা ও বিক্ষোভ, সংকট ও সংকল্পের তাৎপর্যপূর্ণ প্রতিবেদন দেওয়া উপন্যাসের সাধ্যের বাইরেই থেকে যাবে।" (আখতারুজ্জামান, ১৯৯৮ : ৪৯)

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস মনে করেন, সাহিত্য রচনায় সাহিত্যিককে দুটি বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রথমত, ঔপন্যাসিককে সংশয় অবলম্বন করতে হবে, যাতে মানুষকে তিনি খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করতে পারেন। দ্বিতীয়ত, লেখককে সামন্তচেতনামুক্ত হতে হবে। এ বিচারে একদিকে মীর মশাররফ হোসেনের উপন্যাস ব্যক্তিগত আবেগের প্রশ্রয়ে সামন্তচেতনামুক্ত হতে পারেনি। অন্যদিকে মাইকেল মধুসূদন দত্তের লেখা সামন্ত

আভিজাত্যমুক্ত। এই দৃষ্টিতে বাংলা কথাসাহিত্যের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঔপন্যাসিক হিসেবে প্রাবন্ধিকের দৃষ্টিতে পড়েছেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ। প্রাবন্ধিকের মতে, আধুনিক সুনির্মিত উপন্যাসের সমস্ত বৈশিষ্ট্য তাঁর মধ্যে পাওয়া যায়। বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে আধুনিক কথাকার সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ এবং তাঁর *লালসালু* সম্ভবত গ্রাম্য সমাজের স্বরূপ বিশ্লেষণে, কুসংস্কার এবং ধর্মব্যবসার মর্মান্তিক প্রকৃতি নিরূপণে প্রথম আধুনিক প্রচেষ্টা। প্রাবন্ধিকের মতে—

> সংশয়সমৃদ্ধ চিত্তে তিনি সামন্তদেহের একটি প্রধান রোগজীবাণু পিরবাদ নিয়ে খোঁড়াখুঁড়ি শুরু করলেন। বাংলাদেশের প্রথম ঔপন্যাসিক তিনি, আধুনিক নগর চেতনা নিয়ে তিনি যা দেখেন তাই মূল অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। ভক্তিগদগদ চিত্তে তিনি চিড় ধরালেন, এই চিড় আজ ফাটলে পরিণত হচ্ছে। সমাজের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তিকে রেখে প্রশ্নের পর প্রশ্ন উত্থাপন করেন তিনি। সংশয় বাড়ে, ভক্তি ভেঙে যায় এবং এইভাবে উপন্যাস মানুষের সমাবেশে সবল ও সজীব হয়ে ওঠে। (আখতারুজ্জামান, ১৯৯৮ : ৫৪)

শিল্পী অবশ্যই একজন স্রষ্টা কিন্তু সমাজ বিচ্ছিন্ন তো নয়, সামাজিক দায়কে অস্বীকার করে কেবল আঙ্গিক নির্মাণ সত্যিকারের শিল্প হয়ে উঠতে পারে না। যেহেতু সমাজভাবনা কথাসাহিত্যের একটি প্রধান শর্ত তাই সমাজে বসবাসরত মানুষও উপন্যাসের আঙ্গিক অর্থাৎ আধার ও আধেয়র সুসমন্বয় থাকতে হবে বলে প্রাবন্ধিক মনে করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৃতিত্ব উল্লেখ করে বলেন—

> ভক্তি ও বিশ্বাসে সংস্কার ও মূল্যবোধ, সাধ ও সংকল্প এবং উত্তেজনা ও প্রেরণার জবরজং উর্দি তুলে নাবালক ও বামণ এবং পঙ্গু ও রুগ্‌ণ ঐ ব্যক্তিটিকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কাজটি হাতে নিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর ছিল খুঁটিয়ে দেখার ধাত, রক্তের ভেতর তাঁর বিশ্লেষণ করার প্রবণতা। ভক্তিভাব থেকে তিনি মুক্ত একেবারে প্রথম থেকে। (আখতারুজ্জামান, ১৯৯৮ : ৫৭)

"আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের সাহিত্যচিন্তার কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্য জীবন সম্পর্কে সদর্থকচেতনা" (বিশ্বজিৎ, ২০০৯ : ৩৫১)। তাই মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে সাহিত্য বিবেচনার যে প্রয়াস তিনি গ্রহণ করেছেন, সে ধারাতেই সাহিত্যচিন্তার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি সমাজকাঠামোর বিলোপসাধন করে নূতন ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনকে অভিন্ন আর্থিক ও সাংস্কৃতিক মাত্রায় নিয়ে সবাইকে পরিপূর্ণ মানুষের মর্যাদা দেওয়ার লক্ষ্যে মার্কসবাদী দর্শনের সৃজনশীল প্রয়োগ ঘটানোর কথা বলেন। কেননা বিপ্লবের মাধ্যমে সভ্যতার ফসলে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের অধিকার নিশ্চিত করে মার্কসবাদ। বাংলা সাহিত্যে মার্কসবাদী সাহিত্যিকদের মধ্যে অন্যতম মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়; যিনি মধ্যবিত্ত সমাজের একেবারে তলার দিকটা নিয়ে যেমন লিখেছেন তেমনি পরিচয়ের সূত্রে শ্রমিক কৃষকদের নিয়েও লিখেছেন। আখতারুজ্জামান মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যে মার্কসবাদ গ্রহণের কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, সমাজব্যবস্থাকে মানুষের রোগের কারণ জেনে তাঁর ক্রোধ বর্ষিত হয় যে ব্যবস্থার ওপর সে ব্যবস্থাটির বিনাশের সংকল্প থেকেই তিনি মার্কসবাদ গ্রহণ করেন।

> মার্কসবাদকে কেবল তত্ত্ব হিসাবে নিলে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কয়েকটি প্রবন্ধ লিখে বিষয়টিকে প্রাঞ্জল করে ব্যাখ্যা করতে পারতেন। কিন্তু মার্কসবাদ তাঁর কাছে বিদ্যার্চচার বিষয় নয়; এটি তাঁর কাছে মানুষের দুরারোগ্য রোগনিরাময়ের উপায়, মানুষের মানুষ হওয়ার হাতিয়ার। (আখতারুজ্জামান, ১৯৯৮ : ৬৬)

তাইতো মার্কসবাদ গ্রহণ করার পর লেখার উদ্দেশ্য এবং তাঁর বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়েছে। যদিও প্রাবন্ধিক মনে করেন মানিক মার্কসবাদকে গ্রহণ না-করে মানুষের ভেতরের অন্ধকার অনুসন্ধানে নিয়োজিত থাকলেই ভালো করতেন।

উনিশ শতকের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছোটগল্পের গোড়াপত্তন ও তার সংজ্ঞা প্রদান করেন এভাবে—"ছোটো প্রাণ, ছোটো ব্যথা, ছোটো ছোটো দুঃখকথা/ [...] নাহি বর্ণনার ছটা ঘটনার ঘনঘটা" (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৮০ : ৪৫৩)। কিন্তু আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের মতে, মানব জীবনে জটিল সময়ে মানুষের কোন সমস্যাই ছোট নয়। আবার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ছোটগল্পকে সংজ্ঞায়িত করে বলেন : "সে একাগ্নী বান। স্থির লক্ষ্যে, বিদ্যুৎগতিতে, একটি ভাব-পরিমাণকে মর্মঘাতী বিদ্ধ করতে পারলেই তার কর্তব্য শেষ, তার গঠনের ইতর বিশেষে খুব বেশি কিছু আসে যায় না" (নারায়ণ, ১৪০৫ : ৩৪৪)। প্রাবন্ধিক উল্লেখ করেন, একটি ভাব ও পরিণামকে উপস্থাপন করতে গিয়ে সমাজের মধ্যে যে অমানবিকতা, নিষ্ঠুরতা এবং পাশবিকতা এখনও বর্তমান, আমাদের ছোটগল্পে তার সহজ অনুপস্থিতি পীড়াদায়ক। আমাদের আধুনিক সময়ের ছোটগল্পের নানাবিধ বিষয়ের চর্চা করতে গিয়ে ইলিয়াস মন্তব্য করেন—

> কোনো একটি সমস্যাকে কেন্দ্রবিন্দু করে একরৈখিক আলোর মধ্যে তাকে যথাযথ ভাবে নির্দিষ্ট করার শর্তটি পালন করা সৃজনশীল লেখকের পক্ষে দিনদিন কঠিন হয়ে পড়ছে। একটি মানুষকে একটিমাত্র অনুভূতি বা সমস্যা দিয়ে চিহ্নিত করা এখন অসম্ভব। (আখতারুজ্জামান, ১৯৯৮ : ৭২)

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রাজনীতি সচেতন সাহিত্যিক। সাহিত্য-চর্চা করতে গিয়ে নিজের বোধকে বিসর্জন না দিয়ে বরং সাহিত্যে সচেতনভাবে দৈশিক-রাজনৈতিক ঘটনাবলির প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। তাই সমকালীন অনেক লেখকের তুলনায় তাঁর সাহিত্যচর্চা বস্তুধর্মী। উক্ত বক্তব্যে স্পষ্ট যে ইলিয়াসের দৃষ্টিভঙ্গি গতানুগতিক নয়, ভিন্নতর, তাই তিনি গল্পের বিষয়ে সমাজে ছড়িয়ে থাকা নানাবিষয়কে গ্রহণে পক্ষপাতী। তিনি যখন মানুষের সংকট ছোটগল্পে লিপিবদ্ধ করতে চান তখন তাঁর সামনে সংকট ও সমস্যা কোনোটাই আর একরৈখিক বা একমুখী থাকে না, তা হয় বহুধাবিভক্ত। তাকে তিনি গল্পের ভিতরে ছোট ছোট উপগল্প দিয়ে ধরার চেষ্টা করেন। কেননা ইতিহাসের চাকায় যে মানুষ সমাজের পেষণযন্ত্রের নিচে নিজেকে ঢোকাচ্ছে, সেই বেদির তলে মাথা দিয়ে নিজের জীবনকে দিনে দিনে নিঃশেষ করে দিচ্ছে, তার সমস্যা ও সম্ভাবনার কথা লেখার জন্যে একচোখে, একদিকে তাকালে কোনোভাবেই চলে না। ছোটগল্পে এ সংকটের কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে প্রাবন্ধিক বলেন :

> লেখকের কলম থেকে বেরুতে-না-বেরুতে এখনকার চরিত্র বেয়াড়া হয়ে যায়, একটি সমস্যার গয়না তাকে পরিয়ে দেয়ার জন্য লেখক হাত তুললে সে তা ছুড়ে ফেলে দিয়ে গায়ে তুলে নেয় হাজার সংকটের কাঁটা। লেখকের গলা শুকিয়ে আসে, একটি সমস্যার কথা তুলে ধরার জন্য। এত সংকটের ব্যাখ্যা করার সুযোগ এখানে কোথায়? (আখতারুজ্জামান, ১৯৯৮ : ৭২)

নামে ছোটগল্প হলেও আকৃতি ও প্রকৃতি—কোনো দিক থেকেই গল্প ছোট নয়; প্রায় প্রতিটি গল্পের বিষয় হয় বহুদিকস্পর্শী। কেননা একাধিক ব্যক্তির বহু সমস্যা-সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থাপন করা হয় প্রতিটি গল্প। ব্যক্তির সমস্যা এখন আর একরৈখিক নেই, নানা রকম অসংগতি ও অব্যবস্থা যেমন তার ওপর চেপে বসেছে, তেমনি সে নিজেও ছড়িয়ে পড়েছে ক্ষুদ্র গণ্ডি থেকে বিস্তৃত ভূগোলে। ফলে ব্যক্তির কোনো একটি বিশেষ সমস্যার সঙ্গে আধুনিক গল্পকে ধারণ করতে তার একাধিক সমস্যা-সংকটকে। ব্যক্তিকে বৃহত্তর সামাজিক-রাষ্ট্রিক-সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিতে ধারণ করতে গিয়ে ছোটগল্পের বিষয় হয়ে পড়ছে বিস্তৃত ও জটিলতর।

কোনো উপন্যাস বা গল্পের কাহিনি ও চরিত্র যখন বছরের পর বছর, দশকের পর দশক পাঠক মনকে সাড়া দেয়, নাড়া দেয় তখনই মূলত লেখকের সার্থকতা অর্জিত হয়। কথাসাহিত্যিক শওকত ওসমানের গল্প ও উপন্যাস তেমনিভাবে তিন দশক পেরিয়ে গেলেও পাঠক-মনে উজ্জ্বলরূপে অবস্থান করে। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস বলেন—"একটির পর একটি ছবি,

ধারাবাহিক সব ছবি যিনি ৩০/৩৫ বছর ধরে পাঠকের চোখে সেঁটে রাখতে পারেন। পাঠকের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছবিগুলো ঝাপসা না-হয়ে দিন দিন বরং টাটকা হতে থাকে, তিনি তো বড় কম লোক নন।" (আখতারুজ্জামান, ১৯৯৮ : ৮৯)

স্বৈরাচার ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে মানুষের সংঘবদ্ধ প্রতিরোধক রূপকে কবিতায় তুলে ধরেন কবি শামসুর রাহমান। প্রাবন্ধিক বলেন : "১৯৭১ সালের ঢাকা কেবল একটি অবরুদ্ধ নগরী নয়, শামসুর রাহমানের কবিতায় তা শত্রুনিধনের সংকল্পে দৃঢ়চিত্ত সাহসী মানুষের জনপদ" (আখতারুজ্জামান, ১৯৯৮ : ৯৯)। প্রাবন্ধিক এখানে শামসুর রাহমানের *স্মৃতির শহরে* কাব্যগ্রন্থের আলোচনায় বিষয়বস্তু হিসেবে ঢাকাকে এবং ভাষা হিসেবে কথ্য গদ্যরীতির ব্যবহারের সফলতাকে চিহ্নিত করেন। প্রাবন্ধিক বলেন—"কথ্যভঙ্গি তাঁর কবিতাকে লাবণ্যময় ও স্বচ্ছন্দ করে। আবার পাশাপাশি তাঁর গদ্যে কাব্যের প্রভাবও বেশ স্পষ্ট" (আখতারুজ্জামান, ১৯৯৮ : ৯৬)। কবি যে সৃষ্টি সম্পন্ন করেন, যে ছবি গড়েন তা তো বাস্তবেরই প্রতিভাস। যেমন—শামসুর রাহমানের কবিতায় আসাদ, মৌলানা ভাসানী, কাঁচের দোকানের সামনে চিত্রশিল্পী নঈম মিয়া, ঘোড়ার সহিস, হাড্ডিসার লোকটি এদের জীবনাকাঙ্ক্ষায় যে কাব্যিক প্রকাশ তাতে কেবল সমাজের বাস্তব নয় পাশাপাশি মানুষের বাস্তবোত্তীর্ণ মনোভঙ্গির পরিচয়ও স্পষ্ট।

দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন ও সংগ্রামে কোটি কোটি মানুষের মতো শহীদুর রহমানও শুধু ক্ষুব্ধ নন, বিক্ষুব্ধও। শহীদুর রহমানের কবিতা সে অস্থিরতা, উদ্বেগ, ক্ষোভ, ক্রোধ ও বিক্ষুব্ধতার দুঃসাহসিক প্রকাশ। প্রাবন্ধিক বলেন, "শহীদুর রহমানের কবিতায় তার ক্ষুব্ধ চেহারার ভেতরের আঁচটাও গায়ে লাগে" (আখতারুজ্জামান, ১৯৯৮ : ১০৫)। আসলে সাহিত্যের কাজ অনেকাংশে অনির্দিষ্ট, কারণ প্রকৃত বাস্তবও তাই। আর শিল্পীর কাজ হলো বাস্তবতার বহুতলিক নির্মাণ, যার ভিতর দিয়ে শেষ পর্যন্ত বাস্তবের নির্যাসই প্রকাশ পায়। শহীদুর রহমান যেন তাঁর কবিতায় সেই কাজটি দক্ষ হাতে সম্পন্ন করলেন।

লেখক হিসেবে আসহাবউদ্দীন আহমদকে দুঃসাহসিক এবং সচেতন বলে আখ্যা দিলেও প্রাবন্ধিক দেখিয়েছেন যে শেষ পর্যন্ত তিনি লেখায় অস্থিরচিত্তে বিক্ষিপ্ত বিচরণ করেন। কেননা রাজনৈতিক বিশ্বাস ও মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা থাকলেও অধিকাংশ রচনায় প্রসঙ্গকে সংক্ষিপ্ত স্কেচ দেয়ায় সেগুলো যথোচিত রক্তমাংসে পরিণত হতে পারেনি। অন্যদিকে মানুষের জীবনকে খুব তীব্রভাবে দেখার যে দৃষ্টিভঙ্গি আসহাবউদ্দীনের সহজাত তা ভীষণ আকৃষ্ট করে প্রাবন্ধিককে। তাঁর লেখা ছোটগল্পেও দেখি জীবনকে খুব সূক্ষ্মভাবে উপস্থাপনের প্রয়াস। তাঁর সে সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা স্মরণ করে প্রাবন্ধিক বলেন—

> সমকালীন সংকটে তিনি উদ্বিগ্ন, ভবিষ্যৎকে সংকটমুক্ত করার পথ-অনুসন্ধানে তাঁর মনোযোগ নিরঙ্কুশ। ব্যঙ্গ কৌতুক তাঁর বক্তব্য প্রকাশের হাতিয়ার। তাঁর বল ও উদ্যম থেকে নিঃসন্দেহ হতে পারি : এই হাতিয়ারে কোনোদিন মরচে পড়বে না। (আখতারুজ্জামান, ১৯৯৮ : ১১৫)

সমাজমুখী, জীবনবাদী, বাস্তবঘনিষ্ঠ কথাসাহিত্যিক কায়েস আহমেদের *নির্বাসিত একজন* ও *দিনযাপন* উপন্যাসদ্বয় এবং "জগদ্দল" গল্পের আলোচনায় প্রাবন্ধিক তাকে সৎ ও শক্তিশালী লেখক হিসেবে ঘোষণা দেন। কায়েস আহমেদের রচনার বিশেষত্ব হলো গল্প ও উপন্যাসের কাহিনি বয়ানে গড়পড়তা সাফল্যের নিরাপদ ও সুনিশ্চিত পথ পরিহার করা। অথচ মসৃণ ও গতানুগতিক কাহিনি ফেঁদে তিনি বুদ্ধিজীবী ও সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারতেন। যদিও তাঁর প্রথম উপন্যাসের গল্প বলার ধরন কাঁচা; অনেক দুর্বলতা ও অসম্পূর্ণতা

সত্ত্বেও নায়ক-বর্জিত ছিমছাম গল্পমুক্ত সবাক ভাষাচলচ্চিত্র নির্মাণে তিনি সিদ্ধহস্ত। প্রসঙ্গক্রমে প্রাবন্ধিকের উক্তি—"তাঁর সততা সাম্প্রতিক বাংলা কথাসাহিত্যে বিরল। এই সততার বলেই কায়েস আহমেদ কাহিনীর নামে কেচ্ছা বয়ান করার লোভ থেকে বিরত থাকতে সক্ষম হয়েছেন" (আখতারুজ্জামান, ১৯৯৮ : ১২৭)। দেশের রাজনীতি, জাতীয়তাবাদ, দাঙ্গা, স্বাধীনতা প্রভৃতি বিষয় ও সময়কে তুলে এনেছেন তাঁর কথাসাহিত্যে। একটি নিটোল কাহিনি রচনায় ও গল্পের বর্ণনায় তাঁর সংযমের পরিচয় পাওয়া যায়। একদিকে পাঠককে সেটে রাখার জাদু যেমন তিনি আয়ত্ত করেছিলেন, অন্যদিকে তেমনি পাঠকের বুকে বিট বাড়িয়ে দিতে ছিলেন দক্ষ। মানুষের গভীর ভেতরটাকে খুঁড়ে দেখার তাগিদেই যেন রচনা করেন ভিন্নধর্মী চারটি গ্রন্থ। প্রাবন্ধিক বলেন, 'চারটি বই তাই তাঁর নতুন, একটির থেকে আরেকটি যত না উত্তরণ তার চেয়ে অনেক বেশি আলাদা। (আখতারুজ্জামান, ১৯৯৮ : ১৩০)

আবু ইসহাকের *সূর্যদীঘল বাড়ি* সাম্প্রদায়িক ঘটনা নিয়ে লিখিত না হলেও বিষয়ের দিক থেকে যে জরুরি প্রাসঙ্গিকতাকে তুলে ধরে তা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্রাবন্ধিক এ উপন্যাস কেন্দ্রিক চলচ্চিত্রের শিল্পসাফল্য তুলে ধরেছেন। ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে শহরের বিকাশ আসলে ছিল অনেকটা কৃত্রিম এবং তা গ্রামের ওপর প্রবল প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। যদিও এখানে মর্মন্তুদ জীবনবাস্তবতার রূপান্তর অনেকটাই দুর্লক্ষ্য তবু অস্তিত্বের প্রশ্নে সংগ্রামশীল মানুষের প্রচেষ্টায় নিরাসক্ত উপস্থাপন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। *সূর্যদীঘল বাড়ী*তে সংযমের মধ্যে, মাত্রাবোধের সাহায্যে মানুষের বেদনা, ক্ষোভ ও অপমান রূপায়িত হয়েছে। ছিঁচকাদুনে গল্প-উপন্যাস পড়তে পড়তে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠা পাঠকের প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তিত রূপ পরিলক্ষিত হয় উপন্যাসে বর্ণিত মানুষের ব্যক্তিগত ও সংঘবদ্ধ জীবনযাপনের সংগ্রাম, অপমান, পরাজয় প্রত্যক্ষের মাধ্যমে। মানুষের সম্বন্ধে একনিষ্ঠভাবে মনোযোগী হতে পেরেছেন বলেই ঔপন্যাসিকের মতো চলচ্চিত্র পরিচালকও মানুষের বেদনা ও ক্ষোভকে প্রবলভাবে ও গভীর ব্যগ্রতায় ছবিতে উপস্থাপন করতে সমর্থ হয়েছেন।

অভিজিৎ সেন তাঁর লেখায় কোনো ফাঁকা ও ফাঁপা লোকের গল্প ফাঁদেননি। তাঁর *রহু চন্ডালের হাড়* উপন্যাসটি প্রধান চরিত্রবিহীন হলেও এখানে যে শক্তির ইঙ্গিত দেন তা কেবল ব্যক্তির নয়, একক কোনো গোষ্ঠীর নয়, বরং তা হলো মানুষের শক্তি। উপন্যাসটির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে প্রাবন্ধিক বলেন,

> পড়তে শুরু করেই বইটি দারুণ মনোযোগ দাবি করল, পড়তে হয়েছিল আস্তে আস্তে। একটানা পড়বার মতো বই নয়, পাঠককে গ্রাহক ঠাউরে নিয়ে সেঁটে রাখার ফন্দি এখানে প্রয়োগ করা হয়নি। পড়তে পড়তে কাহিনীর সঙ্গে একাকার হয়ে যাওয়া এখানে অসম্ভব, বরং বইটিকে যত্নের সঙ্গে অনুসরণ করতে হয়। (আখতারুজ্জামান, ১৯৯৮ : ১৩৭)

উপন্যাসে বাজিকর গোষ্ঠীর ধর্ম ও ভাষাগত পরিচয়ের পাশাপাশি যে কাম-প্রেম, ক্ষোভ-লোভ, হিংসা-ক্রোধ, ঈর্ষা-বাৎসল্যের প্রকাশ তাতে কোনো ব্যক্তি ও সমষ্টির আলাদা পরিচয় নির্ণয় করা মুশকিল। বন্দি মানুষের মাঝে সুপ্ত স্বাধীনতার স্পৃহা ঘোষিত হয় তাদের কথায় ও গানে। *রহু চন্ডালের হাড়* উপন্যাসটির গুরুত্ব ও ঔপন্যাসিক অভিজিৎ সেনের কৃতিত্ব তুলে ধরেন প্রাবন্ধিক—

> বাজিকরদের দীর্ঘ পদযাত্রায়, ধামান সাঁইয়ের ডাকে, দেবাংশীর আহ্বানে, কুশলীর নবজাতক সন্তানের প্রবল চিৎকারে, করাতের কাছে মহাবৃক্ষের নত হতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনে অভিজিৎ সেন হাজার বছরের বন্দি মানুষের স্বাধীনতার স্পৃহাকে ঘোষণা করেন। মানুষের সংঘবদ্ধ চেতনায় এই স্পৃহা সুপ্ত রয়েছে,

> এই মানুষের ভাষায় এই খোঁজ পাওয়া যায়। তার গানে, তার শ্লোকে, তার প্রবাদে এরই প্রকাশে। তার সংস্কার ও সংস্কার ভাঙা, তার বিশ্বাসে ও বিশ্বাস ঝেড়ে ফেলা—এসবের ভেতরে যে-দ্বন্দ্ব তার মূলে মানুষের মুক্তির কামনা। অতীত থেকে, বর্তমান থেকে, ভাষা থেকে, গান থেকে, শ্লোক থেকে ও পুরাণ থেকে, বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব থেকে মানুষ অবিরাম শক্তিসঞ্চয় করে চলছে। এই শক্তি-অনুসন্ধানের কাজে নিয়োজিত শিল্পী অভিজিৎ সেন। (আখতারুজ্জামান, ১৯৯৮ : ১৪৩-১৪৪)

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস প্রকরণ-পরিচর্যায় নিরীক্ষাপ্রিয় শিল্পী। তিনি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন দীর্ঘ বাক্যগঠনে; এই দীর্ঘ বাক্যপাঠে অনভ্যস্ত পাঠকের কাছে তাঁর গদ্য বিরক্তিকর হলেও সজ্ঞান হৃদয়সংবেদী পাঠক বিষয়ের ভেতরে প্রবেশ করে অনায়াসে।

বাংলা সাহিত্যের প্রথম সফল উপন্যাসগুলো ছিল প্রধানত কুসংস্কার ও ধর্মান্ধ-কেন্দ্রিক। যার ফলে আমাদের উপন্যাস দিনদিন রক্তহীন হয়ে পড়ছে। অথচ দায়বদ্ধ লেখকের প্রধান কাজ ধর্মান্ধতাকে আঘাত করে সামাজিক মানুষের দুঃখ-যন্ত্রণার বাণী প্রতিষ্ঠা করা। যে কাজটি প্রথম করে দেখিয়েছেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্। প্রাবন্ধিক বলেন,

> বাংলাদেশের প্রধান ঔপন্যাসিক প্রয়াত সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ধর্মীয় কিংবা সামাজিক কুসংস্কারকে গৌরব দেওয়ার কাজে লিপ্ত হননি। বরং এই সমাজের ধর্মান্ধতাকেই তিনি প্রবল শক্তিতে আঘাত করেছেন। নিজ সম্প্রদায়ের শেকড়সন্ধানের প্রয়াস এবং পশ্চাৎপদ সংস্কারেকে আঘাত করার চেষ্টা তিনি করেছিলেন একই সঙ্গে। (আখতারুজ্জামান, ১৯৯৮ : ১৪৬)

সাহিত্যে পুরস্কার দেওয়ার সময় একজন লেখককে যে অলিখিত শর্ত দেয়া হয় সেটি যেন একজন ঔপন্যাসিকের ক্ষেত্রে বেশি প্রযোজ্য। শর্তটি হলো : "তোমার লেখা অব্যাহত রাখতে হবে, এবং লেখার মান বাড়ুক কি নাই বাড়ুক অর্জিত মান যেন পড়ে না-যায় সে দিকে লক্ষ রাখবে" (আখতারুজ্জামান, ১৯৯৮ : ১৪৫)। লেখকের দায় অর্জিত মান ধরে রাখা।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের প্রবন্ধে সাহিত্য-ভাবনা দেশ থেকে বিদেশে বিচরণ করেছে। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে অন্যতম অনুপ্রেরণাগত গ্রন্থ গুন্টার গ্রাসের *টিন ড্রাম* কেবল জার্মানিতে নয়, গোটা পশ্চিম ইউরোপ জুড়ে ছিল তাঁর তৎপরতা ও প্রভাব। কোনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের-প্রতিরোধের অদম্য স্পৃহা তৈরি হয় ভরসা থেকে, প্রেরণা থেকে। ১৯৭১ এ সেনাবাহিনীর নৃশংস নির্যাতন যেন সেই স্পৃহাকে নতুন উদ্যমে, নতুন নতুন শিখায় জ্বালিয়ে দিচ্ছিল। অন্যদিকে *টিন ড্রাম* এ এই প্রভাব লক্ষ করে প্রাবন্ধিক বলেন—"১৯৭১ সালের শেষ কয়েকটা মাস অসকারের ড্রামের ডম্বরু আমাদের ভয় ও আতঙ্ককে শ্লেষ, কৌতুক, বিদ্রুপ ও ধিক্কার দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে দেখতে আমাদের প্ররোচিত করে।" (আখতারুজ্জামান, ১৯৯৮ : ১৫৭)

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মাইকেল মধুসুদন দত্তের মতো লেখকরা 'শল্যচিকিৎসকের' মতো নিষ্ঠুর নিস্পৃহভাবে সমকালীন বাস্তবতার সাহিত্যিক রূপ দিয়েছেন। আসলে আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের মানবেতর জীবন, তাদের আশাহীন, ভরসাহীন ভবিষ্যৎ, অকিঞ্চিৎকর জীবনভাবনা, তাদের সংস্কৃতির অতি নিকৃষ্টমান, তাদের দৈনন্দিনের অশিষ্ট ভাষার সাযুজ্যে জীবনযাপন অবলীলাক্রমে গ্রহণ করতে ও সাহিত্যে প্রতিফলিত করতে চেয়েছিলেন আখতারুজ্জামান ইলিয়াস। তাই দায়বদ্ধ সাহিত্যিক ও তাঁদের সাহিত্য বিষয়ে তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিকোণের প্রক্ষেপ লক্ষণীয় *সংস্কৃতির ভাঙা সেতু* প্রবন্ধগ্রন্থের প্রবন্ধসমূহের আলোচনায়।

সাহিত্য ও সাহিত্যিক বিষয়ে *সংস্কৃতির ভাঙা সেতু* প্রবন্ধগ্রন্থের প্রবন্ধগুলো পর্যালোচনা করে বলা যায়, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস জীবনবাদী চেতনা ও সমাজবাদী দৃষ্টি দিয়ে সাহিত্য-শিল্পের

মৌলরূপটি অনুধাবন করেছেন। তাঁর উৎসাহের মূলে আছে শিল্পকর্মকে সমাজের ধূলিমলিনতার উর্ধ্বে তুলে সৌন্দর্য বিচারের পাশাপাশি তাকে সমাজ-সংলগ্ন করে অন্তর্নিহিত সত্য ও শক্তি উদ্‌ঘাটন করা। এক্ষেত্রে তাঁর প্রবন্ধসমূহ বিশ্লেষণাত্মক। সাহিত্যকে তিনি স্বকালের ও স্বসমাজের প্রেক্ষিতে বিবেচনা করেছেন।

প্রবন্ধ মনে হলেই কাঠিন্যের যে ধারণা পাঠকের মনে উঁকি দেয় আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের প্রবন্ধ তার ব্যতিক্রম। তাঁর সাবলীল ও বলিষ্ঠ গদ্য এবং প্রবহমান গতি পাঠককে সহজেই আকর্ষণ করে। গল্পের মতোই তাঁর প্রবন্ধও একেবারে নিজস্ব কথকথার ভঙ্গিতে লেখা। আবার সাহিত্য-সমালোচনায় দুর্লভ নিরপেক্ষতার সাক্ষাৎ মেলে তাঁর প্রবন্ধে। আমাদের বাংলা সাহিত্যের রুচিবোধ ও অভিলাষ, সমস্যা, সংকট ও সম্ভাবনা প্রভৃতি সাহিত্যচিন্তা ধরা পড়েছে তাঁর সাহিত্যালোচনায়। তাই বলা যায়, সাহিত্য-বিশ্লেষণে, আধুনিকতা এবং শিল্প ও শিল্পীর কালগত মূল্যায়নে বাংলাদেশের সাহিত্যে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের *সংস্কৃতির ভাঙা সেতু* প্রবন্ধগ্রন্থটি নিরপেক্ষ সমালোচনামূলক সাহিত্য ভাবনায় উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত।

সহায়কপঞ্জি

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (১৯৯৮)। *সংস্কৃতির ভাঙা সেতু*। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।
—— (১৯৯৯)। *আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনাসমগ্র*। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা ।
আনু মুহাম্মদ (সম্পা., ১৯৯৮)। *তৃণমূল* (আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সংখ্যা)। ঢাকা।
এজাজ ইউসুফী (সম্পা., ১৯৯২)। *লিরিক* (আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সংখ্যা)। চট্টগ্রাম।
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৪০৫)। *সাহিত্যে ছোটগল্প*। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা।
বিশ্বজিৎ ঘোষ (২০০৯)। বাংলাদেশের সাহিত্য। আজকাল প্রকাশনী, ঢাকা।
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (সম্পা., ১৯৮০)। *রবীন্দ্র-রচনাবলী* (প্রথম খণ্ড, কবিতা)। পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা।
শহীদ ইকবাল (২০১৫)। *আখতারুজ্জামান ইলিয়াস মানুষ ও কথাশিল্পী*। অন্বেষণ প্রকাশন, ঢাকা।
সুমন্ত চট্টোপাধ্যায় (১৩১৫)। *হাসান আজিজুল হকের সাক্ষাৎকার, বিজ্ঞাপন পর্ব* (হাসান আজিজুল হক সংখ্যা)। পঞ্চদশ বর্ষ, সংখ্যা ৩-৪, কলকাতা।
সুশান্ত মজুমদার (১৯৯৭)। *আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের গল্প, নতুন স্বর, সুর ও আস্বাদ*। শৈলী (আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সংখ্যা), ঢাকা।